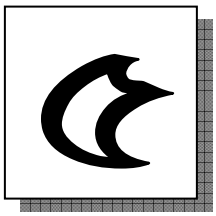

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের সূচনা

বাংলা তথা ভারতে ইংরেজ শাসন একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিলীয়মান মুঘল সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল সুবা বাংলায় ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়া শুরু হয় সতর শতকের শেষদিকে।এর আগে ইউরোপীয়রা যেমন পর্তুগিজ, স্পেনীয়, ডাচ ও ফরাসিরা এদেশে এসেছে বাণিজ্য করে মুনাফা অর্জনের জন্যে। সবশেষে এদেশে এসেছে ইংরেজ বণিকরা– শক্তি ও সামর্থে যারা ছিল তাদের ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। ফলে দেখা যায়, ধাপে ধাপে প্রসারিত হয় ইংরেজদের আধিপত্য। এটা মনে করা ভুল যে, পলাশীর যুদ্ধ শুধুমাত্র বিশ্বাসঘাতার ফল। কারণ পলাশীর পটভূমি তৈরি হয়েছিল অনেক আগে। এদেশের সঙ্গে ইংরেজ বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, সমকালীন ইউরোপে ভৌগোলিক আবিষ্কার ও বাণিজ্যিক বিপ্লবের ওপর ভিত্তি করে যে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং উপনিবেশে বিস্তারে উম্মাদনা তৈরি হয়েছিল তারই পরিণতি পলাশী। ১৬৯৮ সালে কলিকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করে ইংরেজ আধিপত্য প্রসারিত হতে থাকে। ১৬৯৮ থেকে ১৭৫৬ সময়কাল ছিল প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিকাল। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ কোম্পানিকে উদ্বুদ্ধ করে প্রকৃত ক্ষমতা দখলের জন্যে। দেশীয় নরপতিদের মধ্যে মীর কাসিম শেষ চেষ্টা করেছিলেন বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হতে। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। এরপর ১৭৬৫ সালে ইংরেজরা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানী লাভ করে। আলোচ্য ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে এই বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. ইউরোপীয়দের আগমন
- পাঠ-২. সিরাজ উদ্দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধ
- পাঠ-৩. রবার্ট ক্লাইভ
- পাঠ-৪. মীর কাশিম ও বক্সারের যুদ্ধ
- পাঠ-৫. ইংরেজদের দিওয়ানী লাভ ও দ্বৈত শাসন

পাঠ - ১

ইউরোপীয়দের আগমন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *বাংলা তথা ভারতে ইউরোপীয়দের আগমনের পটভূমি ও কারণ জানতে পারবেন;*
- *পর্তুগিজ ও স্পেনীয়দের আগমনের বিষয়টি জানতে পারবেন;*
- *ফরাসি শক্তির আগমন, তাদের বাণিজ্য এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ইংরেজদের সাথে দ্বন্দ্বের বিষয়টি জানতে পারবেন;*
- *বাংলা এবং ভারতে ইংরেজদের আগমন ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিষয়টি জানতে পারবেন।*

পটভূমি

বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে প্রথম পরিচয়ে ইউরোপীয় বণিক, সৈনিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক এবং রাজদূতগণ বিস্ময়ে মুগ্ধ এবং হতবাক হয়েছিলেন।প্রাচীনকালে স্ট্রাবো, হেরোডটাস এবং মেগাস্থিনিসের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, এই অঞ্চলটি বিত্তবৈভব এবং অতুল ঐশ্বর্যের পীঠস্থান ছিল। মধ্যযুগে ইউরোপ থেকে মধ্যপ্রাচ্য এবং ভারত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে বাণিজ্যপথ ছিল তা ইউরোপীয়

এবং আরব বণিকদের মূল ক্ষেত্র ছিল। স্বর্ণ, হীরা-মানিক, দারুচিনি, এলাচ ইত্যাদি ভোগ্যপণ্য প্রাচ্য দেশ থেকে ইউরোপ যেত এবং বাংলা থেকে যেত জগদ্বিখ্যাত মসলিন। অর্থাৎ কল্পনা রঙিন, ঐশ্বর্যবান বাংলার একটি চিত্র বিদেশীদের মনে মুদ্রিত হয়েছিল। ১৪৫৩ খ্রি. তুর্কি শাসকরা কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) দখল করার পর থেকে তারা ভূমধ্যসাগর এলাকায় একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তখন প্রতীচ্যের দেশগুলো একটি বিকল্প বাণিজ্যপথের সন্ধান করেছিল। আর এই মরিয়া প্রচেষ্টা থেকে পনের শতকে শুরু হয় ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং নৌপথে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এজন্যে যে নৌ-দক্ষতা প্রয়োজন তা ইউরোপীয়দের ছিল। তারা উন্নতমানের জাহাজ তৈরি এবং নৌ-বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করে। একই সময় ইউরোপে যে রেনেসাঁ বা নবজাগরণ সৃষ্টি হয়, তাতে গোটা পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে নতুন যুগের সূচনা করে। মানুষের মনে দুঃসাহস এবং অজানাকে জানার দুর্নিবার কৌতূহল তৈরি হয়।

ভারতে আসার প্রথম প্রচেষ্টা চালায় পর্তুগাল ও স্পেনের নাবিকরা। কলম্বাস ভারতে আসার জন্যে যাত্রা করেছিলেন কিন্তু তিনি গিয়ে পৌঁছেন আমেরিকা মহাদেশে। ১৪৯৮ খ্রি. ভাস্কো-দা-গামা ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছেন। এভাবে ইউরোপীয়দের সাথে প্রত্যক্ষ এবং ব্যাপক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

পর্তুগিজ বণিকদের আগমন

পর্তুগিজরা যে কালিকট বন্দরে প্রথম অবতরণ করেছিল, তার সমৃদ্ধি হয়েছিল আরব বণিকদের হাতে। কিন্তু ভাস্কো-দা-গামার পরবর্তী পর্তুগিজ বণিক আলভারেজ কাব্রাল (Alverez Cabral) আরব বণিকদের কালিকট বন্দর থেকে বিতাড়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে কালিকটের জামারিন (রাজা) স্থানীয় মুসলমান, আরব বণিক এবং গুজরাটের রাজার সাহায্যে পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে তাঁর পরাজয় হয়। কোচিনের রাজা পর্তুগিজদের সহায়তা করেন। এরপর পর্তুগিজরা বহু আরব বণিক এবং নাবিকদের নৃশংসভাবে হত্যা করে।

১৫১০ খ্রি. আলবুকার্ক ভারতের গোয়ায় পর্তুগিজ রাজার প্রতিনিধি হিসেবে আসেন। তার সময়েই এশিয়ার চারিদিকের নৌপথে পর্তুগিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়।পারস্য উপসাগরের হরমুজ প্রণালী থেকে মালয়েশিয়ার মালাক্কা এবং ইন্দোনেশিয়ার মশলার দ্বীপগুলোতে তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল। ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলভাগে নতুন রাজ্য গ্রাস করার জন্যে তারা অবিরত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতো। পাশাপাশি তারা চাইতো যে, ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে আগত বণিকদলকে পরাজিত করে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। অন্যদিকে স্থল ও নৌপথে দস্যুবৃত্তি চালাতে পর্তুগিজগণ কোন দ্বিধা করতো না। উনিশ শতকের খ্যাতিমান ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জেমস মিল মন্তব্য করেছিলেন, "পর্তুগিজরা প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্যে বিদেশে যেত। কিন্তু ঐ সময়ের ডাচ এবং ইংরেজদের মতোই সুযোগ পাওয়া মাত্রই লুণ্ঠন করতো।" ধর্ম বিষয়ে তারা অসহিষ্ণু ছিল এবং অধিকৃত অঞ্চলে তারা যে নীতি গ্রহণ করে তা হলো, "হয় খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ কর অথবা মৃত্যুবরণ কর।"

আলবুকার্কের পরবর্তী পর্তুগিজ সেনাপতিরা দিউ, দমন, সলসেট, ব্যাসিল, চৌল, বোম্বাই, সাল্‌টাম, হুগলী অধিকার করে নেয়। এভাবে ভারতে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায় নিয়োজিত আরবিয় বণিকদের হটিয়ে দেয় পর্তুগিজরা। কিন্তু উপমহাদেশে তারা দীর্ঘদিন ব্যবসা করতে পারেনি কিংবা বিজিত অঞ্চলও ধরে রাখতে পারেনি।

অন্যদিকে পর্তুগিজদের সমসাময়িক আরেক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি স্পেন ক্রমশ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ড, হল্যান্ড ও ফ্রান্সের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ও নৌশক্তি বিশ্ব বাণিজ্যে পর্তুগিজ ও স্পেনের আধিপত্যকে বিনষ্ট করে দেয়।

ডাচ বা ওলন্দাজদের আগমন

দীর্ঘকাল থেকেই ডাচ বণিকরা প্রাচ্যদেশের সাথে ব্যবসা ও বাণিজ্য করতো। ১৫৯৫ খ্রি. চারটি ডাচ জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ১৬০২ খ্রি. অসংখ্য ডাচ কোম্পানি মিলে গঠিত হয় ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। নেদারল্যান্ডের পার্লামেন্ট এক চার্টার বা অনুমতিপত্রে এই কোম্পানিকে ডাচ জাতির পক্ষে যুদ্ধ বা সন্ধি, রাজ্য জয় ও দুর্গ নির্মাণের অধিকার প্রদান করেছিল।

ডাচদের প্রধান আকর্ষণের ক্ষেত্র ছিল ইন্দোনেশিয়ার জাভা, সুমাত্রা এবং অন্যান্য মসলা সমৃদ্ধ দ্বীপগুলো, বাংলা কিংবা ভারতবর্ষ নয়। তবে তারা ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপন করতে গিয়ে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য থেকেও সরে আসেনি। গুজরাট, সুরাট, ব্রোচ, ক্যাম্বে, আগ্রা, আহমেদাবাদ, কোচিন, বাংলার চুঁচুঁড়া ইত্যাদি স্থানে তাদের ব্যবসায়িক ঘাঁটি বা কুঠি স্থাপন করে। ১৬৫৮ খ্রি. ডাচরা পর্তুগিজদের পরাজিত করে শ্রীলংকা দখল করে নেয়।

ডাচরা ভারত থেকে নীল, রেশম, তুলা, আলকম আমদানি করতো। ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে আঠার শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ডাচ ও ইংরেজদের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত অব্যাহত ছিল। কিন্তু ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে ডাচদের আধিপত্য ইংরেজরা স্বীকার করে নিলে তারা ভারতের পরিবর্তে সেখানেই মনোযোগী হয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে।

ফরাসিদের আগমন

সমসাময়িক অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের মতো ফরাসি বণিকগণ ভারত এবং বাংলায় বাণিজ্য করতে আসে। ১৬৬৪ খ্রি. চতুর্দশ লুই এর অর্থমন্ত্রী কলভেয়রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'। সম্রাট লুই ব্যবসায়ের জন্যে এই কোম্পানিকে ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে প্রদান করেন। ১৬৬৮ খ্রি. ফ্রাঁসোয়া ফ্যারোঁ সুরাটে প্রথম ফরাসি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। এরপর ফরাসিরা ১৬৬৯ খ্রি. মুসলিপট্টমে আরেকটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন এবং ১৬৭২ খ্রি. ওলন্দাজদের কাছ থেকে সানটুম বাণিজ্য কুঠি দখল করে নেয়। ১৬৭৩ খ্রি. ফরাসিরা পন্ডিচেরীতে তাদের সর্ববৃহৎ বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ফ্রাঁসোয়া মার্টিন, দুমা এবং দুপে-র চেষ্টায় পন্ডিচেরী সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৬৭৪ খ্রি. ফরাসিরা বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের কাছ থেকে চন্দননগরের অধিকার লাভ করে। তবে ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ফরাসিরা ইংরেজদের সাথে প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত হেরে যায়।

ইংরেজদের আগমন

ইংরেজরা হচ্ছে বণিকের জাত। ১৫৯৯ খ্রি. ইংরেজ বণিকরা প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য করার জন্যে গঠন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৬০০ খ্রি. রাণী এলিজাবেথ এই কোম্পানিকে রাজকীয় সনদ বা চার্টার

প্রদান করেন এবং তিনি স্বয়ং এই কোম্পানির একজন অংশীদার ছিলেন। সতের শতকের প্রথম দশকেই ইংরেজরা ভারতে বাণিজ্যের জন্যে পৌঁছে যায়। রাজকীয় অনুগ্রহের আশায় ক্যাপ্টেন হকিন্স নামে এক ব্যক্তিকে আগ্রায় মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে পাঠানো হয়। প্রথমদিকে তাঁর প্রতি সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শন করা হলেও পরবর্তীকালে পর্তুগিজদের ষড়যন্ত্রে তিনি আগ্রার রাজদরবার থেকে বিতাড়িত হন। ফলে তাদের সাথে পর্তুগিজদের সংঘাত অনিবার্য ছিল এবং ১৬১২ খ্রি. সুরাটের সোয়ালী নামক স্থানে ইংরেজরা পর্তুগিজদের পরাজিত করে। ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে আবারও পর্তুগিজরা পরাজিত হয়। পর্তুগিজ-ইংরেজ সংঘর্ষে ইংরেজদের বিজয়ে মুঘলরা বুঝে গিয়েছিল যে, ইংরেজদের সাহায্য নিয়ে নৌপথে পর্তুগিজদের আধিপত্য খর্ব করা যাবে। তদুপরি দেশীয় বণিকরা একাধিক বিদেশী ক্রেতা পাবে এবং পণ্যদ্রব্যেরও চড়ামূল্য পাবে– এই ধারণা মুঘলদের হয়েছিল। এই চিন্তাধারা থেকে মুঘল শাসকরা এক ফরমানের মাধ্যমে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতে কিছু বাণিজ্য কুঠি বা ফ্যাক্টরি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করে।

ইংরেজরা কিছুদিন পরে মুঘলদের কাছ থেকে আরো অনেক সুবিধা পেয়েছিল। ইংল্যান্ড থেকে রাজদূত টমাস রো মুঘল রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে ভারতের সর্বত্র বাণিজ্য কুঠি স্থাপন এবং অবাধ যাতায়তের অধিকার আদায় করে নেন। এতে পর্তুগিজরা প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়। ফলে তারা ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং ১৬২০ খ্রি. এক ভয়ঙ্কর নৌযুদ্ধে পর্তুগিজরা পরাজিত হয়। ১৬৩০ খ্রি. পর্তুগিজ-ইংরেজ বৈরিতার অবসান হয় এবং ১৬৩২ খ্রি. বিবাহের যৌতুক হিসেবে পর্তুগিজরা বোম্বাই দ্বীপটি ইংরেজদের প্রদান করে। উল্লেখ্য সে সময়ে ইংল্যান্ডের রাজা ২য় চার্লস পর্তুগিজ রানীকে বিবাহ করেছিলেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যুদ্ধনীতি

বাণিজ্য বৃদ্ধির পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৮৬ খ্রি. থেকে রাজ্য স্থাপন ও রাজ্য শাসনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। ফলে ঐ বৎসর বাংলায় ইঙ্গ-মুঘল সংঘর্ষ হয় এবং ইংরেজরা বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়। কিন্তু জব চার্নক নামক একজন দূরদর্শী ইংরেজ কর্মকর্তা আপোষের প্রচেষ্টা চালান। ১৬৯০ খ্রি. তিনি কলিকাতার সুতানটিতে ফিরে আসেন। মূলত তাঁর সময়ই (১৬৯০ খ্রি.) কলিকাতা নগরীর পত্তন হয়। ১৬৯৮ খ্রি. কলিকাতা, সুতানটি, গোবিন্দপুর– এই তিনটি গ্রামের জমিদারী লাভ করে কোম্পানি। ১৭০০ খ্রি. বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্য কুঠিগুলো একত্রিত করে একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঐ বছরই একটি সুরক্ষিত দুর্গ স্থাপন করা হয় এবং ইংল্যান্ডের রাজা ৩য় উইলিয়ামের নামানুসারে নাম রাখা হয় ফোর্ট উইলিয়াম। নবগঠিত কাউন্সিলের সদর দপ্তর স্থাপিত হয় ফোর্ট উইলিয়ামে এবং এর প্রথম প্রেসিডেন্ট বা গভর্নর নিযুক্ত হন চার্লস আয়ার।

ইতোমধ্যে বাংলা এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজরা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিকে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়ে দেয়। শুধুমাত্র ফরাসিরা বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ছিল। ইংরেজরা বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের জন্যে বিভিন্ন কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং মুঘল রাজদরবারে দূত প্রেরণ অব্যাহত রাখে। এই নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলও তারা পায়। ১৭১৭ খ্রি. মুঘল সম্রাট ফররুখশিয়ার এক ফরমানে বাংলা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার প্রদান করেন। একই সময় ইংরেজরা নিজেদের মুদ্রা প্রচলনের অধিকার লাভ করে। অনেক ঐতিহাসিক এই ফরমানকে বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে দায়ী করেছেন। বস্তুত, বাংলা তথা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকরা বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ তাদের ভবিষ্যত সাম্রাজ্যের ভিত্তি নিপুণভাবে স্থাপন করে।

সারসংক্ষেপ

বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের সমৃদ্ধি ইউরোপীয়দের এদেশে আগমনে উৎসাহী করে তোলে। ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগীজরা প্রথম ভারতে আসে। ক্রমে ডাচ (ওলন্দাজ), ফরাসি, ইংরেজদের আগমন ঘটে। তারা বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে।বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যায় ইংরেজরা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)।*
২। ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*
৩। Muhammed Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* Vol. 1(A).
৪। J.N. Sarkar, *History of Bengal,* Vol. II.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে বাংলায় প্রথম এসেছিল–
(ক) ইংরেজরা (খ) পর্তুগিজরা
(গ) ফরাসিরা (ঘ) দিনেমাররা।

২। ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়–
(ক) ১৬০০ খ্রি. (খ) ১৬০১ খ্রি.
(গ) ১৬০২ খ্রি. (ঘ) ১৬০৩ খ্রি.।

৩। ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয় কার উদ্যোগে?
(ক) কলভেয়র (খ) চতুর্দশ লুই
(গ) জ্যাক শিরাক (ঘ) দ্য গল।

৪। কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠা হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
(ক) ১৬০০ খ্রি. (খ) ১৬৩০ খ্রি.
(গ) ১৬৬০ খ্রি. (ঘ) ১৬৯০ খ্রি.।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ইউরোপীয়রা ভারতে আসার বাণিজ্য পথ কেন সন্ধান করছিল?
২। আলবুকার্ক কে ছিলেন?
৩। ডাচদের তৎপরতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
৪। কিভাবে কলিকাতা মহানগরীর পত্তন হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। কেন ও কিভাবে ইউরোপীয়রা বাংলা এবং ভারতে আগমন করে? পর্তুগিজ ও ওলন্দাজদের এ অঞ্চলে আগমন এবং তাদের তৎপরতা সম্পর্কে বিবরণ দিন।

২। কেন ইংরেজরা বাংলা ও ভারতে এসেছিল? কিভাবে তারা তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল?

পাঠ - ২

সিরাজ উদ্দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *নবাব সিরাজ উদ্দৌলার প্রাথমিক অসুবিধাসমূহ এবং কিভাবে তিনি সেগুলো অতিক্রম করেন সে বিষয়ে জানবেন;*
- *ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সিরাজের বিরোধের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধের পটভূমি ও যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবেন;*
- *পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ও সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।*

বাংলার মসনদে সিরাজের আরোহণ ও তাঁর প্রাথমিক অসুবিধাসমূহ

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজ উদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের মসনদে বসেন। আলিবর্দী খান মৃত্যুর পূর্বেই সিরাজকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। সিরাজ উদ্দৌলার জন্ম হয়েছিল ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে এবং মুর্শিদাবাদের মসনদে বসার সময় তাঁর বয়স ছিল ২৩ বছর। ইতোপূর্বে মাতামহের সান্নিধ্যে থেকে তিনি সমরনীতি ও শাসন বিষয়ে দীক্ষা লাভ করেন। আলিবর্দী খান তাঁকে বিহারের নায়েব নাযিম নিযুক্ত করেন। তিনি মাতামহের সঙ্গে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও অংশ নেন। এসব অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও মসনদে আসীন হয়ে তিনি অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। সিরাজের প্রতি বিরূপ থাকায় তাঁর খালা ঘসেটি বেগম সিরাজের এক খালাতো ভাই শওকত জঙ্গকে মসনদে বসানোর জন্য ষড়যন্ত্র করেন। তিনি তাঁর বিপুল সম্পদ ও প্রতিপত্তি নতুন নবাবের বিরুদ্ধে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। অন্যদিকে নবাবের প্রধান সেনাপতি ও বখশী মীর জাফরের ভূমিকাও ছিল কুচক্রীর। এদের প্ররোচনা ও সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জঙ্গ সিরাজের প্রতি অবাধ্য হন এবং তাঁর আনুগত্য মেনে নিতে অস্বীকার করেন।

মসনদে আরোহণের পর সিরাজ উদ্দৌলা যথেষ্ট সাহস ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, ঘরের শত্রুকে দমন করতে না পারলে তাঁর মসনদ নিষ্কণ্টক হবে না। তিনি প্রথমে প্রশাসনে কতিপয় রদবদল করেন। মীর জাফরকে বখশীর পদ থেকে অপসারণ করে মীর মদনকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন।

তাঁর পারিবারিক দেওয়ান মোহনলালকে সচিব পদে উন্নীত করেন এবং তাঁকে মহারাজা উপাধিসহ প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা দেয়া হয়। মোহনলালের পিতৃব্য জানকিরামকে 'রায় রায়ান' উপাধিসহ নিজের দেওয়ান নিযুক্ত করেন। এরপর নবাব শত্রুদের বিরুদ্ধে আঘাত হানেন। প্রথমে তিনি ঘসেটি বেগমের মতিঝিল প্রাসাদ অবরোধ করে ধনরত্নসহ তাঁকে নবাবের মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে নিয়ে আসেন। এরপর নবাব শওকত জঙ্গকে দমনের উদ্দেশ্যে পূর্ণিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি সৈন্যবাহিনীসহ রাজমহল পৌঁছলে শওকত জঙ্গ ভয় পেয়ে নবাবের প্রতি আনুগত্য দেখান। এতে সিরাজ তাঁর সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে নেন।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বিরোধ

নবাব সিরাজ উদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধ সৃষ্টি হয়। সিরাজ যখন মসনদে বসেন তখন প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ উপঢৌকনসহ তাঁকে অভিনন্দন জানায়, কিন্তু ইংরেজ বণিকরা তা করেনি।এ স্বীকৃত রীতি উপেক্ষা করায় নবাবের প্রতি অসম্মান করা হয়। দ্বিতীয়ত, কোম্পানির কর্মচারীরা বেআইনীভাবে ব্যক্তিগত ব্যবসায় লিপ্ত হয় এবং ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাটের দেয়া ফরমানের সুবিধার অপব্যবহার করে। কোম্পানির গভর্নর দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের জন্য তাদেরকে দস্তক দিতেন। এভাবে শুল্ক ফাঁকি দেয়ায় মুঘল রাজকোষের অসামান্য ক্ষতি হয়।সিরাজ উদ্দৌলা দস্তকের অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দিলেও ইংরেজ গভর্নর ড্রেক সে নির্দেশ উপেক্ষা করেন। তৃতীয়ত, ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধার উপক্রম হয়। এর প্রভাব ভারতে ইংরেজ ও ফরাসি বণিকদের ওপর এসে পড়ে। ইংরেজরা এ পরিস্থিতিতে কলিকাতায় এবং ফরাসিরা চন্দননগরে সমরসজ্জা ও দুর্গ নির্মাণ করতে শুরু করে। সিরাজ উদ্দৌলা ইউরোপীয় বণিকদের এদেশে দুর্গ নির্মাণের কাজ বন্ধ করার আদেশ দেন। ফরাসিরা তাঁর আদেশ মেনে নেয়, কিন্তু কলিকাতার ইংরেজ গভর্নর ড্রেক নবাবের নির্দেশ অমান্য করে দুর্গ নির্মাণ কাজ চালাতে থাকে। চতুর্থত, কলিকাতার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নবাবের অবাধ্য ও অপরাধী কর্মচারীদেরকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে উষ্কানীমূলক কাজে লিপ্ত হয়। জাহাঙ্গীরনগরের দিওয়ান রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ নবাবের রাজস্বের বহু অর্থ নিয়ে কলিকাতায় পালিয়ে যায় এবং ইংরেজদের আশ্রয় নেয়। এতে নবাব ইংরেজদের ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। তিনি বিচারের জন্য কৃষ্ণবল্লভকে তাঁর নিকট প্রত্যার্পণ করতে ইংরেজ গভর্নর ড্রেককে নির্দেশ দেন।ড্রেক নবাবের আদেশ অমান্য করেন এবং নবাবের দূত নারায়ণ দাসকে কলিকাতা থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। ইংরেজদের এসব আচরণে নবাব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।

ইংরেজদের ঔদ্ধত্যে এবং অবাধ্যতায় ক্রোধান্বিত হয়ে নবাব সিরাজ উদ্দৌলা তাদের শাস্তি দেবার জন্য অগ্রসর হন।১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুন নবাব ইংরেজদের কাসিমবাজার কুঠি অধিকার করে কলিকাতার দিকে অগ্রসর হন। বাংলার সৈন্যবাহিনীকে বাধা দিতে ব্যর্থ হয়ে ড্রেক অধিকাংশ ইংরেজদেরকে নিয়ে জাহাজে আশ্রয় নেন। সিরাজ উদ্দৌলা এক রকম বিনা বাধায় কলিকাতা দখল করেন। কয়েকজন আহত ও বন্দি ইংরেজ সৈন্যকে একটি কক্ষে আবদ্ধ রাখা হয়। এদের মধ্যে ১৬ জন মৃত্যুবরণ করে। হলওয়েল নামক জনৈক ইংরেজ কর্মচারী এ ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। ইংরেজরা কলিকাতা থেকে বিতাড়িত হয়ে ফলতায় আশ্রয় নেয় এবং নবাব তাঁর সেনাপতি মানিক চাঁদকে কলিকাতার শাসনভার দিয়ে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন।

কলিকাতা জয়ের পর নবাব সিরাজ উদ্দৌলা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শওকত জঙ্গকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে পূর্ণিয়ার দিকে অগ্রসর হন। মনিহারী নামক স্থানে উভয় বাহিনীর যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে শওকত জঙ্গ পরাজিত ও নিহত হন। ইতোমধ্যে কলিকাতার পতনের খবর মাদ্রাজে পৌঁছলে মাদ্রাজ পরিষদ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসনের নেতৃত্বে একদল সৈন্য ও নৌবহর পাঠায়। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর ইংরেজ নৌবহর ভাগীরথী নদীতে প্রবেশ করে এবং ফলতার ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে এদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই ক্লাইভ ও ওয়াটসন কলিকাতা আক্রমণ করে তা পুনরুদ্ধার করেন এবং ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ সুরক্ষিত করেন। কলিকাতার গভর্নর মানিক চাঁদ নবাবের সাথে বিশ্বাসঘাকতা করেন। তাঁর অধীনে পর্যাপ্ত সৈন্য থাকা সত্ত্বেও তিনি যুদ্ধ না করে কলিকাতা থেকে সরে যান।

ইংরেজদের কলিকাতা দখলের সংবাদ পেয়ে সিরাজ উদ্দৌলা পুনরায় সসৈন্যে কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি নবাবের বাহিনী কলিকাতার উপকণ্ঠে পৌঁছলে ক্লাইভ ও ওয়াটসন অতর্কিতে তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। এতে নবাবের সৈন্যদলে কিছুটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পাল্টা আক্রমণের পর ইংরেজ বাহিনী কলিকাতার দুর্গে পলায়ন করে। কলিকাতা জয় করার মতো নবাবের যথেষ্ট সৈন্যশক্তি ছিল। কিন্তু এ সময় তাঁর সেনাপতিদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তিনি সন্দিহান হয়ে ওঠেন। তাছাড়া তখন আহমদ শাহ আবদালীর বিহার আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ অবস্থায় নবাব ক্লাইভের সঙ্গে আলীনগরের সন্ধি (৯ ফেব্রুয়ারি, ১৭৫৭ খ্রি:) নামে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্তমতে নবাব ইংরেজদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের অঙ্গীকার করেন। তাদের বাণিজ্য সুবিধা প্রত্যার্পণ করা হয় এবং কলিকাতার দুর্গ সুরক্ষিত করার অনুমতিও তারা লাভ করে।

ক্লাইভ আলীনগরের সন্ধিকে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি বলেই মনে করেন এবং নবাবের সঙ্গে চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। ইউরোপে তখন ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হলে এর প্রভাব বাংলায়ও এসে পড়ে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে কলিকাতার ইংরেজরা বাংলার নবাবের নিষেধ অগ্রাহ্য করে ফরাসিদের কুঠি চন্দননগর অধিকার করে নেয়। এ সময় নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে উৎখাতের জন্য মুর্শিদাবাদে এক গোপন ষড়যন্ত্র দানা বাঁধে। মীর জাফরকে মসনদে বসাবার উদ্দেশ্যে ইয়ার লুৎফে খান, খাদিম হোসেন, রায় দুর্লভ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ প্রমুখ সৈন্যাধ্যক্ষ ও সভাসদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এরা নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ক্লাইভ উক্ত ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করার জন্য উমিচাঁদকে দালাল নিযুক্ত করেন এবং তাকে ২০ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল কলিকাতা কাউন্সিল নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার পক্ষে প্রস্তাব পাশ করে। মীর জাফরের সঙ্গেও ইংরেজদের একটি খসড়া চুক্তি অনুমোদিত হয়।

ষড়যন্ত্রের উদ্যোগ-পর্ব শেষ হলে ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে সন্ধি ভঙ্গের মিথ্যা অভিযোগ এনে ইংরেজ সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করেন। নবাবের হুগলী ও কাটোয়ার ফৌজদাররা তাঁকে বাধা দেয়নি। ইতোমধ্যে নবাব সিরাজ উদ্দৌলা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও গোপন চুক্তির কথা অবহিত হন। নবাব এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং মুর্শিদাবাদ থেকে ২৩ মাইল দক্ষিণে পলাশী প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন ক্লাইভের সৈন্যবাহিনী ও নবাবের মধ্যে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মীর জাফর, রায় দুর্লভ ও খাদিম হোসেন তাদের সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। নবাবের পক্ষে মোহন লাল, মীর মদন ও সিমফ্রে মরণপন লড়াই করেও সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বিজয়ী হতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের নামে যে প্রহসন ঘটে তাতে নবাবের বিশ্বস্ত বাহিনী পলায়ন করে। নবাব পলাশী থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তখন ভয়ভীতি বিরাজ করছিল এবং নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না। চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে

নবাব সিরাজ উদ্দৌলা পাটনায় পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি ধরা পড়েন এবং তাঁকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে মীর জাফরের পুত্র মিরণের নির্দেশে মুহম্মদী বেগ তাঁকে হত্যা করে (২ জুলাই, ১৭৫৭ খ্রিঃ)।

পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল

পলাশীর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পতন। যুদ্ধের পর তাঁকে হত্যা করা হয় এবং মীর জাফর বাংলার মসনদে বসেন। কিন্তু বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ায় মীর জাফর ক্রীড়ানকে পরিণত হন। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যিক ও সামরিক আধিপত্য বহুগুণে বাড়ে। নতুন নবাবের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ কোম্পানি প্রচুর অর্থ লাভ করে। উৎকোচ হিসেবেও কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিপুল অর্থের মালিক হয়। শুধুমাত্র বাংলায়ই ইংরেজদের একক বাণিজ্যিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, চব্বিশ পরগণার জমিদারীও তারা লাভ করে। পলাশীর পর বাংলার অপ্রতুল সম্পদ ইংরেজদের করায়ত্ত হওয়ায় শীঘ্রই তারা দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে স্বীয় আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হয়। পরবর্তীকালে উপমহাদেশে যে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এর সূচনা পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমেই ঘটে।

পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের কারণ

পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা। তবে শুধু মীর জাফরের বিশ্বাসভঙ্গের কারণেই সিরাজের পরাজয় ঘটেনি। এজন্য তিনি নিজেও কিছুটা দায়ী ছিলেন। মসনদে বসার পর সিরাজ উদ্দৌলা যে সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন, শেষের দিকে সেরকম মনোবল তিনি রাখতে পারেননি। আহমদ শাহ আবদালীর বিহার আক্রমণের আশঙ্কা এবং মীর জাফর সহ সেনাপতি, কর্মচারীদের অকর্মণ্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা জেনে তিনি বিমূঢ় হয়ে পড়েন। দ্বিতীয়ত, নৌশক্তির দুর্বলতা নবাবের সমর পরিকল্পনাকে ব্যাহত করে। নবাব সিরাজ উদ্দৌলা ইংরেজদেরকে কলিকাতা থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হলেও ভাগিরথী নদী হতে তাদেরকে বহিষ্কার করতে পারেননি। যখন ক্লাইভ ও ওয়াটসন মাদ্রাজ হতে সৈন্য ও নৌবাহিনী নিয়ে হুগলী নদীতে অনুপ্রবেশ করেন তখন তাদেরকে প্রতিরোধ করার মতো নৌশক্তি নবাবের ছিল না। তৃতীয়ত, তিনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন বাংলার পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাঁর অনুকূলে ছিল না। সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতিতে সমাজ জীবন সে সময় ছিল কলুষিত। সেনাপতি, মন্ত্রী, কর্মচারী ও সৈন্যরা তুচ্ছ ব্যক্তিগত স্বার্থে জাতীয় ও জনস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতেন। এসব কারণে তারা রাজদ্রোহী হন এবং বাংলার স্বাধীনতা বিসর্জন দেন।

সারসংক্ষেপ

নবাব আলিবর্দী খানের উত্তরাধিকারী সিরাজ উদ্দৌলা বাংলার মসনদে বসার পর একদিকে তিনি রাজ পরিবারের একাংশের বিরোধিতার সম্মুখীন হন, অন্যদিকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গেও তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। ঘরের শত্রুকে অনায়াসে দমন করা সম্ভব হলেও বিদেশী বণিক ইংরেজদেরকে চূড়ান্তভাবে প্রতিহত করতে তিনি ব্যর্থ হন। প্রধান সেনাপতি মীর জাফরের ক্ষমতা লিপ্সা ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নবাব জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ উদ্দৌলা পরাজিত হন এবং পরে তাঁকে হত্যা করা হয়। মসনদে বসেন মীর জাফর। ইংরেজরা এরপর থেকে বাংলায় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে এবং বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একক

আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। পলাশী যুদ্ধের ফলে বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের পথ তৈরি হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)।*

২। ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*

৩। এম.এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭–১৯৪৭)।*

৪। Muhammed Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* Vol.1(A).

৫। B.K. Gupta, *Sirajuddowla & the East India Company.*

৬। J.N. Sarkar, *History of Bengal,* Vol. II.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। সিরাজ উদ্দৌলা কত বছর বয়সে মসনদে বসেন?
(ক) ১৭ বছর (খ) ২১ বছর
(গ) ২৩ বছর (ঘ) ২৫ বছর।

২। শওকত জঙ্গ কোথাকার শাসনকর্তা ছিলেন?
(ক) আলীনগর (খ) পূর্ণিয়া
(গ) রাজমহল (ঘ) বিহার।

৩। সিরাজ যখন মুর্শিদাবাদের মসনদে বসেন তখন কলিকাতার ইংরেজ গভর্নর কে ছিলেন?
(ক) ক্লাইভ (খ) ড্রেক
(গ) ওয়াটসন (ঘ) মানিক চাঁদ।

৪। 'অন্ধকূপ হত্যা' কাহিনী কার তৈরি?
(ক) হলওয়েল (খ) মীর জাফর
(গ) ক্লাইভ (ঘ) কর্নওয়ালিস।

৫। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ কোথায় অবস্থিত ছিল?
(ক) ঢাকায় (খ) মুর্শিদাবাদে
(গ) কলিকাতায় (ঘ) আগ্রায়।

৬। আলীনগরের সন্ধি কখন হয়?
(ক) ১০ এপ্রিল, ১৭৫৬ (খ) ১৪ ডিসেম্বর, ১৭৫৬
(গ) ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৭৫৭ (ঘ) ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৭৫৭।

৭। নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে কে হত্যা করেন?
(ক) মীর জাফর (খ) উমিচাঁদ
(গ) মুহম্মদী বেগ (ঘ) মীর মদন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। বাংলার সিংহাসন লাভের পর সিরাজ উদ্দৌলার প্রাথমিক অসুবিধাগুলো কি ছিল?
২। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সিরাজ উদ্দৌলার বিরোধ হয়েছিল কেন?
৩। পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ব্যাখ্যা করুন।
৪। সিরাজ উদ্দৌলা পলাশীর যুদ্ধে কেন পরাজিত হন?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সিরাজ উদ্দৌলার বিরোধের কারণসমূহ কি ছিল? পলাশীর যুদ্ধে তিনি কেন পরাজিত হয়েছিলেন?
২। পলাশীর যুদ্ধের পটভূমি বর্ণনা করুন। এই যুদ্ধের ফলাফল কি ছিল?

পাঠ - ৩

রবার্ট ক্লাইভ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *ক্লাইভের প্রাথমিক জীবন এবং তার উত্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *বাংলায় এবং ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান ব্যক্তি হিসেবে ক্লাইভের কর্মকান্ডের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *বাংলা এবং ভারতে ক্লাইভের দ্বিতীয় পর্যায়ের শাসন সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *ক্লাইভের বিভিন্ন সংস্কার এবং তার সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন করতে পারবেন।*

বাংলা তথা ভারতে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠায় সর্বাগ্রে যার নাম করতে হয়, তিনি হলেন রবার্ট ক্লাইভ। ১৭৫৬ থেকে ১৭৬০ খ্রি. পর্যন্ত বাংলায় ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় ক্লাইভের অবদান ছিল অনেক। কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ষড়যন্ত্র, শঠতা, জালিয়াতি, দুর্নীতি ও সকলঘৃণ্যপন্থার আশ্রয় গ্রহণকরেছিলেন। তার এসব অপকর্মকে দেখতে হবে ব্রিটিশ জাতির অবস্থান থেকে।স্বীকার করতে হবে তিনি ছিলেন ক্ষুরধার কূটনৈতিক জ্ঞানের অধিকারী এবংএকজন দক্ষ সেনাপতি।তবে দুর্নীতি, অর্থলিপ্সা এবং ষড়যন্ত্রের মতো নীচ ও জঘন্যতম বিষয়গুলো ক্লাইভের চরিত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

ক্লাইভের প্রাথমিক জীবন

রবার্ট ক্লাইভ ১৭২৫ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বয়স যখন ১৯ বছর তখন তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কেরানি হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর প্রথম কর্মস্থল ছিল মাদ্রাজ। কিছুদিনের মধ্যে তিনি কেরানির চাকরি পরিত্যাগ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাদলে যোগ দেন এবং ১৭৫১ খিস্টাব্দের মধ্যে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন। একই সময় ভারতে ইংরেজদের সাথে ফরাসিদের তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। বিশেষ করে কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংরেজরা ফরাসিদের হাতে যখন পরাজিত হতে চলছিল সেই মুহূর্তে ক্লাইভের রণকৌশল ইংরেজদের শুধু রক্ষাই করেনি বরং ঐতিহাসিক বিজয় এনে দিয়েছিল। কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধে ক্লাইভ ফরাসিদের সরাসরি আক্রমণ না করে কর্ণাটকের রাজধানী আর্কট দখল করেন। ফরাসিরা ৫৩ দিন যুদ্ধ করে আর্কট দখল করতে পারেনি। এরপর ক্লাইভ অর্নি ও কাবেরী পাকের যুদ্ধে ফরাসিদের পরাজিত করে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। কর্নাটকের সিংহাসনে ইংরেজদের সমর্থিত প্রার্থী মোহাম্মদ আলীকে বসানো সম্ভব হয় এবং সেখানে ফরাসিদের আধিপত্য লোপ পায়। এভাবে ক্লাইভের রণনৈপুণ্য, সাহস এবং বিচক্ষণতার কারণে ভারতে ইংরেজরা ফরাসিদের পেছনে ফেলে অনেক এগিয়ে যায় এবং ক্লাইভের সুনামও বৃদ্ধি পায়।

নবাব সিরাজ উদ্দৌলা কলিকাতা অধিকারের মধ্য দিয়ে যখন বাংলায় ইংরেজ স্বার্থ চূড়ান্ত হুমকির সম্মুখীন তখন ক্লাইভ মাদ্রাজ হতে বাংলায় আসেন। তিনি এবং ওয়াটসন সহজেই কলিকাতা ও হুগলী পুনরুদ্ধার করেন। এরফলে নবাব বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। ক্লাইভ নবাবকে বাধা দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য করেন।এটি আলীনগরের সন্ধি নামে খ্যাত এবং এই সন্ধি অনুযায়ী ইংরেজরা বিনাশুল্কে বাণিজ্য, ফোর্ট উইলিয়ামে দুর্গ স্থাপন সহ আরো অনেক সুবিধা পায়। নবাবের সাথে সন্ধি করলেও ক্লাইভ নিশ্চিত হতে পারেননি। তিনি বুঝতে পারলেন যে, সিরাজ ক্ষমতায় থাকলে বাংলায় ইংরেজ স্বার্থ রক্ষা সম্ভব নয়। তদুপরি ফরাসিরা নবাবের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ছিল এবং নবাবের সাথে তাদের মিত্রতা ঘনিষ্ঠতর হচ্ছিল। তিনি বাংলায় ফরাসিদের আধিপত্য ধ্বংস করার জন্যে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কর্ণাটকের তৃতীয় যুদ্ধের সময় ক্লাইভ চন্দননগরে ফরাসি বাণিজ্য কুঠি দখল করে নেন। এই ঘটনায় নবাব রুষ্ট হন এবং তিনি ফরাসিদের পক্ষে অবস্থান নেন। এতে ক্লাইভের উদ্বেগ অনেক বৃদ্ধি পায়।

এই সময় মুর্শিদাবাদে (বাংলার রাজধানী) নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে একটি গোপন ষড়যন্ত্র চলছিল। ক্লাইভ এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। তিনি দেখলেন যে, ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। ক্লাইভ ইংরেজ স্বার্থের জন্যে চক্রান্ত, জালিয়াতি, দুর্নীতি, অন্যায় ও অবিচার ইত্যাদি নীচ ও ঘৃণ্য পথ অবলম্বন করেন। নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী দলের নেতা ছিলেন মীরজাফর। ক্লাইভ সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে মীরজাফরকে ক্ষমতায় বসানোর জন্যে গোপন চুক্তি করেন এবং এজন্যে তিনি অর্থ ও বাণিজ্য সুবিধা লাভের প্রতিশ্রুতি পান। এতে ক্লাইভের চরিত্রের স্বার্থপরতা ও নীচতার পরিচয় প্রকাশিত হয়।

মীরজাফরের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে ক্লাইভ নবাব সিরাজের সাথে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন। পলাশীর প্রান্তরে সিরাজের পরাজয় ঘটলে বাংলায় ক্লাইভ ক্ষমতার নেপথ্য নায়কে পরিণত হন।নতুন নবাব মীরজাফর ক্লাইভের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। মীরজাফর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ২৪ পরগনায় জমিদারী প্রদান করে এবং কোম্পানি তাঁকে এই জমিদারীর গভর্নর নিযুক্ত করে। ক্লাইভ স্বয়ং বিশাল অংকের টাকা ও জমি গ্রহণ করেন।এদিকে নতুন নবাব মীরজাফর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। যেমন মেদিনীপুরের শাসনকর্তা রামরাম সিংহ, পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা হাজির আলী এবং আলী গোহর (পরবর্তীকালে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম নামে খ্যাত) বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মীরজাফর ক্লাইভের সমর্থনে এবং সহযোগিতায় এসব বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হন। এর পুরস্কার হিসেবে মীরজাফর ক্লাইভকে কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলের একটি অংশের জায়গীর প্রদান করেন। এই অঞ্চলটি ক্লাইভের জায়গীর নামে পরিচিত ছিল। নতুন নবাবের প্রচন্ড অর্থনৈতিক সংকট সত্ত্বেও ক্লাইভ মীরজাফরের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করতে বিলম্ব করেননি।

নতুন নবাবকে হাতের পুতুলে পরিণত করা ছাড়াও ক্লাইভ ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন। এর মধ্যে ছিল ফরাসিদের উত্তর-সরকার অধিকার এবং ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে জয়লাভ। ১৭৫৯ খ্রি. ফরাসি গভর্নর কাউন্ট লালি দাক্ষিণাত্য থেকে দুর্ধর্ষ ফরাসি বুসিকে প্রত্যাহার করলে একটি সাময়িক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে চতুর ক্লাইভ ইংরেজ সেনাপতি কর্নেল ফোর্ডকে উত্তর-সরকার দখল করার জন্যে প্রেরণ করেন। ফোর্ড প্রায় বিনা প্রতিরোধে ফরাসিদের বিতাড়িত করে উত্তর-সরকার দখল করেন। ১৭৫৯ খ্রি. ইন্দোনেশিয়ার বাটাভিয়া (বর্তমান জাকার্তা) থেকে বেশকিছু ওলন্দাজ সৈন্য হুগলী আক্রমণ করে। ক্লাইভ সহজেই এদের পরাজিত করে বাংলায় ইংরেজ আধিপত্যকে আরো বিস্তৃত করেন।

ক্লাইভের দ্বিতীয় পর্যায়ের শাসনকাল (১৭৬৫–৬৭ খ্রি.)

ক্লাইভের অবর্তমানে বাংলায় কুশাসনের ব্যাপকতা প্রকট হয়ে ওঠে। কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নানারকম দুর্নীতিতে লিপ্ত হয় এবং দস্তকের অপব্যবহার করতে থাকে। ফলে বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘোর অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় দুর্নীতি ও অব্যবস্থার অবসানের জন্যে কোম্পানির পরিচালকমন্ডলী লর্ড ক্লাইভকে দ্বিতীয়বার বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। যদিও অনেক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, "চুরি এবং দুর্নীতি বন্ধের জন্যে এক মহাচোরকে নিযুক্ত করা হয়েছিল"।

দিওয়ানী লাভ

দ্বিতীয়বার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে ক্লাইভ যখন বাংলায় আসেন, তখন তাঁর সামনে কতগুলো সমস্যা ছিল। তিনি লক্ষ্য করেন যে, বক্সারের যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় যে ক্ষমতা লাভ করে তার কোন আইনগত ভিত্তি ছিল না। কারণ বক্সারের যুদ্ধে মোঘল সম্রাট পরাজিত হলেও তিনিই ছিলেন সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। বক্সারের যুদ্ধের পর অযোধ্যার নবাবের সাথে কোন সন্ধি সম্পাদিত হয়নি। বাংলার নবাবের সাথেও কোম্পানির সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং ক্লাইভের সামনে প্রধান দুটি সমস্যা ছিল। প্রথমত, বাংলা ও অযোধ্যার দুই নবাব ও মোঘল সম্রাটের সাথে কোম্পানির সম্পর্ক স্থির করা। দ্বিতীয়ত, শাসন কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রবর্তন করে অব্যবস্থা ও দুর্নীতির অবসান করা।

বক্সারের যুদ্ধের পর অযোধ্যার নবাব ও দিল্লির মোঘল সম্রাট দুর্বল হয়ে পড়েন। ক্লাইভ ইচ্ছা করলেই অযোধ্যা ও দিল্লি দখল করতে পারতেন। কিন্তু তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বাইরে কোম্পানির রাজ্যের সীমা বিস্তার না করার নীতি অনুসরণ করেন। বরং তিনি তাদেরকে ইংরেজদের ওপর নির্ভরশীল করে রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি অযোধ্যায় নবাব সুজা উদ্দৌলাকে নবাব হিসেবে স্বীকৃতি দেন। ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবং কারা ও এলাহাবাদ জেলা আদায় করেন। তখন দিল্লিতে মুঘল সম্রাট শাহ আলম ছিলেন একজন দুর্বল শাসক। যেহেতু আইনগতভাবে তিনিই ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তাই তাঁর কাছ থেকে দিওয়ানী লাভের পদক্ষেপ নেন। ক্লাইভ শাহ আলমকে কারা ও এলাহাবাদ এলাকা দুটি প্রদান করেন এবং বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দিওয়ানী লাভ করেন।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দিওয়ানীর গুরুত্ব অনেক। কারণ এর মাধ্যমেই কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়। এরপর নবাবের পদ বাহ্যিকভাবে রাখা হলেও তাঁর প্রকৃত প্রশাসনিক ক্ষমতা আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। ক্লাইভ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, দিওয়ানীর মাধ্যমে কোম্পানি বাংলায় সকল ক্ষমতার উৎসে পরিণত হয়। নায়েব সামরিক ক্ষমতা কোম্পানির হাতে চলে যায় এবং তিনি কোম্পানির নিযুক্ত নায়েব সুবা মোহাম্মদ রেজা খানের হাতে নিজামতের যাবতীয় ক্ষমতা তুলে দিতে বাধ্য হন। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, দিওয়ানী লাভের পর থেকে কোম্পানির রাজস্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ফলে একদিকে যেমন আর্থিক স্বচ্ছলতা আসে, অন্যদিকে তেমনি সৈন্যসংখ্যাও বৃদ্ধি করে কোম্পানি রাজ্য বিস্তারেও সমর্থ হয়।

দ্বৈত শাসন

যেহেতু এই ইউনিটের অন্য একটি পাঠে (পাঠ-৫) দ্বৈত শাসন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, ফলে এখানে সংক্ষেপে এবং প্রসঙ্গক্রমে কিছু আলোচনা করা হবে। কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যাপক দুর্নীতি, দেশীয় রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা এবং বিদেশী বণিক (যেমন ফরাসি, ডাচ)দের ঈর্ষা ইত্যাদি কারণে ক্লাইভ দিওয়ানীর কাজ প্রকাশ্যভাবে কোম্পানির হাতে নেননি। তিনি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কোম্পানির মনোনীত রেজা খান এবং সিতাব রায় নামে দু'জন নায়েব সুবার হাতে ন্যস্ত করেন। শুল্ক আদায়, দিওয়ানী ও ফৌজদারি মামলার ভারও এদের হাতে তুলে দেয়া হয়। এসব নায়েব সুবারা আইনত নবাবের অধীনে ছিলেন, তবে তাদের প্রধান কাজ ছিল কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করা। ক্লাইভের প্রবর্তিত এই ব্যবস্থাই দ্বৈত শাসন (Double government) ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। অর্থাৎ শাসন ক্ষমতা নবাব ও কোম্পানির মধ্যে ভাগ করা হয়। রাজস্ব আদায়ের মালিক হয় কোম্পানি। নবাব পেলেন ক্ষমতাহীন দায়িত্ব এবং কোম্পানি লাভ করলো দায়িত্বহীন ক্ষমতা। এই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা ছিল ত্রুটিপূর্ণ এবং এতে বিশৃঙ্খল ও অরাজক পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে। বাংলার অর্থনৈতিক দূরবস্থা প্রকট হয়ে ওঠে এবং বাংলা থেকে অর্থ ব্রিটেনে চলে যায়। এক হিসাবে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দেই ৫.৭ মিলিয়নের মতো অর্থ ইংল্যান্ডে পাচার হয়েছিল। এই নির্মম লুণ্ঠনের কারণে অচিরেই বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

ক্লাইভের সংস্কার

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর নির্দেশ অনুযায়ী ক্লাইভ দুর্নীতি দূরীকরণের জন্যে কয়েকটি সংস্কার প্রবর্তন করেন। প্রথমত, তিনি কোম্পানির কর্মাচারীদের পুরস্কার গ্রহণ এবং ব্যাবসা-বাণিজ্য করার বিষয়টি নিষিদ্ধ করেন। দ্বিতীয়ত, ক্লাইভ কোম্পানির কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ক্লাইভ কোম্পানির সিভিল সার্ভিসে সংস্কার করেন। তিনি কোম্পানির কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্যদের মধ্যে পাঁচ জনকে অবসর দেন এবং তিনজনকে সদস্যপদ থেকে বরখাস্ত করেন। তাদের পরিবর্তে তিনি নতুন এবং দক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ করেন।

ক্লাইভ সামরিক বিভাগেও সংস্কার করেন। সেনাবাহিনীর ব্যয় হ্রাসের জন্যে ক্লাইভ সৈনিকদের দ্বিগুণ ভাতা বন্ধ করে দেন। মীরজাফর পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যদের সহায়তায় কৃতজ্ঞ হয়ে সৈন্যদের ভাতা দ্বিগুণ করেন। কথা ছিল যুদ্ধের সময় সৈনিকরা এরকম ভাতা পাবে। কিন্তু দেখা গেল, শান্তির সময়ে দ্বিগুণ ভাতা দেয়া হচ্ছিল। ক্লাইভ ঘোষণা করলেন যে, যুদ্ধে নিযুক্ত সৈন্যরা এরূপ ভাতা পাবে। এতে বিদ্রোহ দেখা দিলে ক্লাইভ কঠোর হাতে তা দমন করেন।

ক্লাইভের মূল্যায়ন

ক্লাইভ তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন একজন সাধারণ কেরানি হিসেবে। কিন্তু তিনি ছিলেন পরিশ্রমী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং একজন ধূর্ত ব্যক্তি। বাংলায় এসে তিনি উদ্ভাবনী শক্তি এবং ধূর্ততার মাধ্যমে গভর্নর পদ লাভ করেছিলেন।যদিও তিনি দুর্নীতিপরায়ণ এবং অর্থলোভী ছিলেন, তথাপি সে সময় কোম্পানির পরিচালকমন্ডলী মনে করেছিলেন যে, বাংলা ও ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষায় তিনিই সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। ঠিক এই কারণেই তাঁকে দ্বিতীয়বার গভর্নর করে পাঠানো হয়েছিল। ক্লাইভ যুদ্ধ পরিকল্পনা, যুদ্ধ জয় এবং ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোকে পরাজিত করে বাংলা তথা ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর নিজ চরিত্র এবং কিছু কর্মকান্ডের ফলে ইংরেজ জাতির নামে কলঙ্ক লেপন হয়েছে সত্য, তবু তাঁরই চেষ্টায় ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়াপত্তন হয়েছিল। ইঙ্গ-ভারতীয় ইতিহাসে তাই ক্লাইভের নাম সবার আগে স্মরণীয়।

সারসংক্ষেপ

রবার্ট ক্লাইভ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন সাধারণ কেরানি হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু পরিশ্রম, উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে বাংলার গভর্নর হন। কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যষড়যন্ত্র, শঠতা, দুর্নীতির আশ্রয়নিতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। যে কারণে তাঁকে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। তারই প্রচেষ্টায় ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়াপত্তন হয়েছিল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০–১৮৫৭ খ্রি.)।*

২। ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*

৩। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ক্লাইভ কত খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন–

(ক) ১৭২০ খ্রি. (খ) ১৭২৫ খ্রি.

(গ) ১৭৩০ খ্রি. (ঘ) ১৭৩৫ খ্রি.।

২। ক্লাইভ কোন যুদ্ধে প্রথম রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন–

(ক) কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধে (খ) পলাশীর যুদ্ধে

(গ) বক্সারের যুদ্ধে (ঘ) মাদ্রাজের যুদ্ধে।

৩। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত খ্রি. দিওয়ানী লাভ করে–

(ক) ১৭৬০ খ্রি. (খ) ১৭৬২ খ্রি.

(গ) ১৭৬৫ খ্রি. (ঘ) ১৭৭০ খ্রি.।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ক্লাইভের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

২। ক্লাইভের বিভিন্ন সংস্কার সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৩। সংক্ষেপে ক্লাইভের মূল্যায়ন করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। ক্লাইভের উত্থান এবং বাংলায় কোম্পানিকে এক নম্বর শক্তিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আলোচনা করুন।

২। ক্লাইভের দ্বিতীয় পর্যায়ের শাসনকাল সম্পর্কে বিবরণ দিন।

৩। ক্লাইভের চরিত্রের একটি মূল্যায়ন তৈরি করুন।

পাঠ - ৪

মীর কাশিম ও বক্সারের যুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *মীর কাশিমের ক্ষমতা গ্রহণ এবং তাঁর শাসন নীতি সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *ইংরেজদের সঙ্গে মীর কাশিমের বিরোধের কারণ এবং যে পরিস্থিতিতে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সে সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;*
- *বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল, গুরুত্ব এবং যুদ্ধে মীর কাশিমের পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।*

মীর কাশিমের ক্ষমতা লাভ ও তাঁর শাসন নীতি

নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার কাজে ক্লাইভের সহযোগিতার বিনিময়ে মীর জাফর ইংরেজদেরকে প্রভুত অর্থ প্রদানে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু মসনদে বসে মীর জাফর ইংরেজ কোম্পানিকে তাঁর চুক্তি অনুযায়ী প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি লাভের আশায় মীর জাফর ওলন্দাজ ও আর্মেনিয়ান বণিকদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইংরেজ কোম্পানির কলিকাতা কাউন্সিল মীর জাফরকে অপসারণ করে তাঁর জামাতা মীর কাশিমকে মসনদে বসাবার সিদ্ধান্ত নেয়। মীর কাশিম এক গোপন চুক্তিতে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম– এ তিন জেলার জমিদারী ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করেন। বিনিময়ে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব পদে আসীন হন।

নবাব মীর কাশিম ছিলেন একজন দূরদর্শী ও স্বাধীনচেতা শাসক। মসনদে বসেই তিনি অনুধাবন করেন যে, ইংরেজদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতে হলে তাঁকে প্রথমেই চুক্তিবদ্ধ ঋণ পরিশোধ এবং নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। সেজন্য দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিকে পুনর্জীবিত করার লক্ষ্যে তিনি কতিপয় সংস্কার সাধন করেন। মীর জাফরের অযোগ্যতা ও প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে সরকারি আমলা ও কর্মচারীরা এমন দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠে যে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ ও পদমর্যাদার অপব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করা এক রীতিতে পরিণত হয়। মীর কাশিম দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব নেন এবং তাদের অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। বহু উচ্চপদস্থ দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের বরখাস্ত করা হয়। তাছাড়া সরকারি ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত রাজকর্মচারীদের ছাঁটাই করা হয়। সরকারের অর্থিক চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যে তিনি জগৎশেঠ পরিবার থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করেন। প্রত্যেক জমিদারীর প্রকৃত সম্পদ অনুসন্ধান করে মীর কাশিম জমিদারদের সঙ্গে রাজস্বের নতুন বন্দোবস্ত করেন। এর ফলে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব ধার্য ও সংগৃহীত হয়। যেসব জমিদার অবাধ্য ও বিদ্রোহী হয়েছিল তাদেরকে তিনি দমন করেন ও নিয়মিত রাজস্ব আদায়ে বাধ্য করেন। বিহারের ডেপুটি নায়েব রাম নারায়ণ প্রভুত সরকারি অর্থ কুক্ষিগত করে হিসাব প্রদানে গড়িমসি করায় বিলম্বে হলেও নবাব তাকে বরখাস্ত ও কারারুদ্ধ করেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা পুন:প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মীর কাশিম তাঁর শক্তিবৃদ্ধিরও চেষ্টা করেন। মীর জাফরের আমলের দুর্নীতিপরায়ণ ও বিশ্বাসঘাতক কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করে নবাব নিজের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেন।সেনাবিভাগেও তিনি কিছু রদবদল করেন।তিনি আর্মেনিয়ানদেরকে তাঁর সৈন্যদলে ভর্তি করেন এবং সৈন্যবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। গুর্গিন খান নামক জনৈক আর্মেনিয়ান নায়কের ওপর সেনাদল পুনর্গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। গোলন্দাজ ও পদাতিক সৈন্যদেরকে ইউরোপীয় কায়দায় প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়। মুহাম্মদ তকী খান নামে একজন সেনানায়কও নবাবকে তাঁর প্রতিরক্ষা বাহিনী সুশৃঙ্খল করার কাজে সাহায্য করেন। রাজধানী মুর্শিদাবাদ ছিল ইংরেজ কোম্পানির ক্ষমতার কেন্দ্র কলিকাতার অতি নিকটে। তাছাড়া মুর্শিদাবাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত দুর্বল। এজন্য কলিকাতার কর্তৃপক্ষের পক্ষে নবাবের কার্যকলাপের ওপর নজর রাখা ও শাসন বিষয়ে হস্তক্ষেপের সুবিধা ছিল। এসব সমস্যা বিবেচনায় রেখে মীর কাশিম ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তর করেন।

মীর কাসিমের সাথে ইংরেজ বিরোধ

মীর কাশিম ক্ষমতায় আরোহণ করে একে একে সব অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূর, তাঁর শত্রুদের দমন এবং স্বীয় শক্তি শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। কিন্তু দেশ শাসনে তাঁর স্বাধীন নীতি ও গৃহীত কার্যকলাপ ইংরেজদের পছন্দ হলো না। কোম্পানির অনেক কর্মকর্তা নবাবকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেন এবং তাঁর নীতি শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে আশংকা করেন। মীর জাফরকে পদচ্যুত করে মীর কাসিমের মতো যোগ্য ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসানো ও অভ্যন্তরীণ সংস্কারের মাধ্যমে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করার সুযোগ দেয়া একটি রাজনৈতিক ভুল বলে এদের নিকট প্রতীয়মান হয়। এ আশংকাই তাদেরকে নবাবের বিরুদ্ধে ঈর্ষান্বিত করে তোলে। শীঘ্রই বাণিজ্যিক সুবিধাদি নিয়ে মীর কাসিমের সাথে ইংরেজদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের মুঘল সম্রাটের ফরমান অনুযায়ী ইংরেজ কোম্পানি বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার পায়। দস্তকের ব্যবহার বা বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার কোন অধিকার সেই ফরমান বা পরবর্তীকালের কোন চুক্তিতে কোম্পানির কর্মচারীদের বেলায় প্রযোজ্য ছিল না। কিন্তু তারা কোম্পানির বাণিজ্যিক সুবিধার অপব্যবহার করে বেআইনী ব্যক্তিগত ব্যবসায় লিপ্ত হয় ও বাণিজ্য কর ফাঁকি দেয়। পলাশীর যুদ্ধের পর অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে কোম্পানির কর্মচারীদের তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পায়, এমনকি ইংরেজদের দেশীয় নায়েব-গোমস্তারাও এর সুযোগ নিতে থাকে। এতে সরকার শুল্কখাতে বিরাট অংকের রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয় এবং অন্যান্য বণিকরাও ভীষণ অসুবিধায় পড়ে। কারণ বিধিমাফিক বাণিজ্য কর দিতে হতো বিধায় তাদের পণ্যের দাম বেশি হতো এবং এহেন অসম বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার ফলে ইংরেজ ও তাদের আশ্রিতদের সঙ্গে তাদের টিকে থাকা দুঃসাধ্য হয়েপড়ে। এর ফলে বিশেষত দেশীয় বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়। একচেটিয়াভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে কোম্পানির কর্মচারী ও তাদের গোমস্তারা। এদের উৎপীড়নমূলক ব্যক্তিগত ব্যবসা ও অত্যাচারে পণ্য উৎপাদকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ এ শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা জোরপূর্বক ন্যায্যমূল্যের কম দামে পণ্য দ্রব্য কিনে নিতো। এর ফলে দেশে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং দেশের আর্থিক সমস্যাও বাড়ে।

নবাব মীর কাশিম ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের বিরুদ্ধে ইংরেজ গভর্নর ভ্যান্সিটার্টকে অবহিত করেন এবং তা বন্ধের দাবি জানান। কলিকাতা কাউন্সিল নবাবের অভিযোগ উপেক্ষা করলে তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য তাদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করার নির্দেশ দেন। কিন্তু ইংরেজ কর্মচারীরা বাণিজ্য শুল্ক দিতে অস্বীকার করায় নবাবের শুল্ক বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে তাদের

সংঘাত বাধে। এরপর নবাব বাংলায় সব বণিকদের ওপর থেকে বাণিজ্য কর প্রত্যাহার করেন। এতে অন্যান্য বণিকরাও বিনাশুল্কে বাণিজ্যের সুবিধা লাভ করে। এ ব্যবস্থার ফলে ইংরেজ কোম্পানির বিশেষ সুবিধা বাতিল হয়ে যাওয়ায় তারা নবাবের ওপর ক্ষেপে যায়।

নবাবের সাথে সমঝোতায় আসার উদ্দেশ্যে গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট তাঁর প্রতিনিধি এমিয়েটকে পাঠান। কিন্তু সমস্যার কোন শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়নি। এদিকে পাটনার ইংরেজ কুঠির এজেন্ট এলিস হঠাৎ করে পাটনা আক্রমণ ও তা দখল করেন। এতে নবাবের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। মীর কাশিমের সৈন্যবাহিনী পাল্টা আক্রমণ করে পাটনায় ইংরেজ কুঠি বিধ্বস্ত করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তারা গভর্নরের দূত এমিয়েটকে হত্যা করে। এরপর কলিকাতা কাউন্সিল নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয় এবং মীর কাশিমকে পদচ্যুত করে মীর জাফরকে পুনরায় বাংলার মসনদে বসায় (২৪ জুলাই, ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ)।

মীর কাশিম তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। কিন্তু নবাবের সেনাবাহিনীর প্রধানদের কপটতা ও দুর্বল সামরিক তৎপরতার কারণে কাটোয়া, গিরিয়া, মুর্শিদাবাদ, সোতি ও উদয়নালার যুদ্ধে তিনি পরাজয় বরণ করেন। ইংরেজ সৈন্যরা তাঁকে অনুসরণ করে রাজধানী মুঙ্গের থেকেও বিতাড়িত করে। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে পাটনার যুদ্ধে মীর কাশিমের সৈন্যদল সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হলে নিরূপায় হয়ে তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার রাজ্যে আশ্রয় নেন। মীর কাশিম নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে এক মৈত্রী জোট গঠন করেন এবং তাঁদের সম্মিলিত বাহিনী বিহারের দিকে অগ্রসর হয়। ইংরেজ সেনাপতি হেক্টর মনরো এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মিত্রপক্ষের গতিরোধ করে। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বক্সার নামক স্থানে উভয়পক্ষে ঘোরতর লড়াই হয়। মীর কাশিম ও তাঁর মিত্ররা এ যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। বাংলার নবাব বক্সারের প্রান্তর থেকে পালিয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করেন। কয়েক বছর অজ্ঞাতবাস করে ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি দিল্লির নিকটে মারা যান। বক্সারের যুদ্ধে বিজয়ী ইংরেজ সৈন্যরা অযোধ্যায় প্রবেশ করলে সুজাউদ্দৌলা রাজ্য ত্যাগ করে রোহিলাখন্ডে আশ্রয় নেন। কোন দিক থেকে সাহায্য না পেয়ে পরে তিনি ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। সম্রাট শাহ আলমও ইতোপূর্বে কোম্পানির সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ হন।

বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল ও গুরুত্ব

ইতিহাসে বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব অত্যধিক এবং এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এ যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল নবাব মীর কাশিমের পতন এবং মীর জাফরের পুনরায় বাংলার মসনদে আরোহণ। তাছাড়া এ যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে শক্তিশালী অযোধ্যা রাজ্যের অধিপতি এবং দিল্লির মুঘল সম্রাটের পরাজয় ঘটে। বাংলায় ও উত্তর ভারতে স্বাধীন শাসন ক্ষমতার পতন এবং এর ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক শূন্যতা এখানে পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসনের পথ তৈরি করে। বক্সারের যুদ্ধ কেবল বাংলাতেই ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেনি, তাদের আধিপত্য ও প্রভাব অযোধ্যা এবং এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সামরিক দিক থেকে এ যুদ্ধ ইংরেজদের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পলাশীতে তারা জয়ী হলেও তা ছিল যুদ্ধের নামে একটা প্রহসন। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে তাদের যুদ্ধ কৌশল ও সমর নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। এতে তাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। বস্তুত পলাশীতে জয়ী হবার ফলে বাংলায় ইংরেজ প্রভূত্বের সূচনা হয়। বক্সারের যুদ্ধের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে তারা নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এখানে ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত ঘটায়।

মীর কাশিমের পরাজয়ের কারণ

স্বাধীনচেতা নবাব মীর কাশিম ইংরেজ আধিপত্য থেকে মুক্তি লাভের আশায় বিরোধে জড়িয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত অবধারিত সংঘর্ষে পরাজিত হন। তাঁর পরাজয়ের পেছনে কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, অর্থনৈতিক দুর্বলতা তাঁর পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল। মীর জাফরের ঋণের বাবদ ইংরেজদের তিনি বিপুল অর্থ দেন। মসনদ লাভের জন্যও তাদেরকে তাঁর অনেক টাকা দিতে হয়। অর্থ সংকটের কারণে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করতে তিনি সক্ষম হননি। দ্বিতীয়ত, জমিদার ও কর্মচারীরা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না। এদের অসহযোগিতার কারণে মীর কাশিম তাঁর শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারেননি। তৃতীয়ত, যুদ্ধক্ষেত্রে কোন কোন সৈন্যাধ্যক্ষের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাবের পরাজয় ঘটে। উদয়নালার যুদ্ধে সেনাপতি মরকা ও আরাটুন গোপনে শত্রুদের সাহায্য করেন এবং বক্সারের যুদ্ধে সুজাউদ্দৌলার উজির মহারাজা বেশী বাহাদুর বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। চতুর্থত, সামরিক ক্ষেত্রে মীর কাশিম এবং তাঁর সৈন্যদলের দুর্বলতা পরাজয়ের আর একটি বড় কারণ। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের সমর নৈপুণ্য ও রণকৌশল নিঃসন্দেহে উন্নততর ছিল। তাছাড়া মীর কাশিম নিজেও সেনাপতিরূপে দক্ষতা ও প্রতিভার পরিচয় দেননি। তাঁর সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংগঠনের অভাব ছিল। তাই তিনি যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পরাজয় বরণ করেন।

সারসংক্ষেপ

ইংরেজদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মীর কাশিম বাংলার মসনদে আসীন হন। কিন্তু দেশ পরিচালনায় তাঁর স্বাধীন কার্যক্রম ইংরেজ কর্তৃপক্ষের পছন্দ হলো না। বিশেষ করে ইংরেজ বণিকদের ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যে কোন কর না দেয়ার কারণে নবাবের সঙ্গে কোম্পানির বিরোধ শুরু হয়। অনিবার্য সংঘর্ষের ফলে মীর কাশিমের সামরিক পরাজয় ঘটে। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে বক্সারের যুদ্ধে তিনি একাই পরাজিত হননি। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং দিল্লির মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমও এ যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন। এর ফলে ভারত উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের পথ সুগম হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০–১৮৫৭ খ্রি.)।*

২। ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*

৩। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মীর কাশিম কখন বাংলার নবাব হন?

(ক) আগস্ট, ১৭৫৯ খ্রি. (খ) ফেব্রুয়ারি, ১৭৬০ খ্রি.

(গ) অক্টোবর, ১৭৬০ খ্রি. (ঘ) জানুয়ারি, ১৭৬১ খ্রি.।

২। কোন আর্মেনিয়ান সেনাপতির ওপর মীর কাশিম তাঁর সৈন্যদল পুনর্গঠনের দায়িত্ব দেন?

(ক) আরাটুন (খ) গুর্গিন খান

(গ) সেনাপতি মরকা (ঘ) সেনাপতি মর্কট।

৩। মীর কাশিম কোথায় তাঁর রাজধানী স্থানান্তর করেন?

(ক) মুর্শিদাবাদ (খ) উদয়নালা
(গ) পাটনা (ঘ) মুঙ্গের।

৪। ভ্যান্সিটার্ট কে ছিলেন?
(ক) ইংরেজ সেনাপতি (খ) কলিকাতার ইংরেজ গভর্নর
(গ) একজন পরিব্রাজক (ঘ) ইংরেজ গোমস্তা।

৫। বক্সারের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়?
(ক) ১৭৬০ খ্রি. (খ) ১৭৬২ খ্রি.
(গ) ১৭৬৪ খ্রি. (ঘ) ১৭৭৭ খ্রি.।

৬। কোন মুঘল সম্রাট বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হন?
(ক) দ্বিতীয় শাহ আলম (খ) ফররুখশিয়ার
(গ) জাহান্দর শাহ (ঘ) দ্বিতীয় আকবর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। কি পরিস্থিতিতে মীর কাশিম বাংলার মসনদে আসীন হন?
২। মসনদে বসে স্বীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মীর কাশিম কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন?
৩। ইংরেজদের সাথে মীর কাশিমের বিরোধের প্রধান কারণ ব্যাখ্যা করুন।
৪। বক্সারের যুদ্ধের ঐতিহাসিক ফলাফল আলোচনা করুন।
৫। বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশিম কেন পরাজিত হন?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। ইংরেজদের সাথে মীর কাশিমের বিরোধের কারণগুলো কি ছিল? তিনি কেন পরাজিত হয়েছিলেন?
২। যে পরিস্থিতিতে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা আলোচনা করুন। এই যুদ্ধের ফলাফল ও গুরুত্ব কি ছিল?
৩। বক্সারের যুদ্ধের পটভূমি ব্যাখ্যা করুন। মীর কাশিম কেন এই যুদ্ধে পরাজিত হন?

পাঠ - ৫

ইংরেজদের দিওয়ানী লাভ ও দ্বৈত শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *দিওয়ানী কি এবং কি পরিস্থিতিতে ইংরেজরা দিওয়ানী লাভ করে তা জানতে পারবেন;*
- *ইংরেজদের দিওয়ানী লাভের ফলে সৃষ্ট দ্বৈত শাসনের স্বরূপ ও চরিত্রের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হবেন;*
- *দ্বৈত শাসনের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।*

বক্সারের যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করে প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পথে তখন কোন বাধা অবশিষ্ট ছিল না। মীর জাফর পূর্ব থেকেই কোম্পানির ওপর নির্ভর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তির ফলে তিনি তাঁর দরবারে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখতে রাজি হন। আরোপিত শর্তের কারণে নবাবের অর্থনৈতিক দুরবস্থা বৃদ্ধি পায় এবং সামরিক ক্ষেত্রেও তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মীর জাফরের মৃত্যুর পর কোম্পানি তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্র নজমুদ্দৌলাকে মসনদে বসায়। কিন্তু তাঁর শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয় একজন ইংরেজ প্রতিনিধির হাতে। এর ফলে সরাসরি ইংরেজ রাজত্বের সূচনা না হলেও বাংলায় ক্ষমতার চাবিকাঠি ইংরেজদের হাতেই পৌঁছে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি রবার্ট ক্লাইভ দ্বিতীয়বারের মতো কলিকাতা কাউন্সিলের গভর্নর হয়ে এলে মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সাথে এক চুক্তিতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব ক্ষমতা লাভ করেন। বাংলায় সূচিত হয় ঔপনিবেশিক শাসনের।

কোম্পানির দিওয়ানী লাভ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানী লাভ বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মুঘল শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যেক সুবা বা প্রদেশে সুবাদার ও দিওয়ানী নামে দু'জন কর্মকর্তা ছিলেন। এরা উভয়েই মুঘল সম্রাট কর্তৃক সরাসরি নিযুক্ত হতেন এবং স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সম্রাটের নিকট জবাবদিহি করতেন। সুবাদার বা নাজিমের অধীনে ছিল প্রতিরক্ষা, বিচার ও বেসামরিক প্রশাসন; আর দিওয়ানের দায়িত্বে ছিল মূলত রাজস্ব শাসন। ক্ষমতার এই বিন্যাসে স্বাধীন অবস্থানে থেকে তাঁরা একে অপরকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতেন এবং কেউ কারো কাজে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতেন। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খানের সুবাদারী লাভের পূর্ব পর্যন্ত সুবাদারী ও দিওয়ানী পৃথক পৃথক ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত ছিল। মুর্শিদকুলী খানই সর্বপ্রথম এই শাসনতান্ত্রিক প্রথা ভঙ্গ করে দিওয়ানীর দায়িত্বও নিজে গ্রহণ করেন এবং তাঁর পরবর্তী অন্যান্য সুবাদাররা সে রীতি অনুসরণ করায় দিওয়ানী ও নিজামত শাসন একীভূত হয়ে পড়ে।

পলাশীর যুদ্ধের পর নবাবের নিজামত ক্ষমতা হ্রাস পায়। মীর কাসিম স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতে চেয়ে সিংহাসনচ্যুত হন। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে নবাব মীর জাফরের মৃত্যুর পর ইংরেজগণ তাঁর

অল্পবয়স্ক পুত্র নজমুদ্দৌলাকে বাংলার সিংহাসনে বসায়। নতুন নবাব ছিলেন সম্পূর্ণভাবে কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল এবং তাদের হাতের পুতুল মাত্র। বক্সারের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে দিল্লির সম্রাট শাহ আলমও তখন হয়ে পড়েন অসহায় এবং ইংরেজদের কৃপাপ্রার্থী। এ সময় লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয় বারের মতো বাংলার গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অত্যন্ত সুচতুর ও বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন ক্লাইভ ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখলেও কোম্পানির স্বার্থকেই তিনি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন। তিনি এলাহাবাদে সম্রাট শাহ আলমের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রচুর উপহার দেন। সম্রাটের মর্যাদা রক্ষার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তিনি কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানী প্রদানের প্রার্থনা করেন। সম্রাট পলাশী যুদ্ধের পর থেকে বাংলার রাজস্ব পেতেন না। সুবা বাংলা আবার দিল্লির নিয়ন্ত্রণে আসবে, এমন আশাও তিনি ত্যাগ করেছিলেন। এমতাবস্থায় সম্রাট শাহ আলম বিনা দ্বিধায় ক্লাইভের প্রস্তাবে রাজি হন এবং ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট এক চুক্তিতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব শাসন ক্ষমতা কোম্পানির হাতে ছেড়ে দেন। এলাহাবাদের সন্ধি নামে এ চুক্তিতে স্থির হয় যে, দিওয়ানী লাভের বিনিময়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সম্রাটকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা এবং নিজামত শাসনের জন্য মুর্শিদাবাদের নবাবকে বছরে ৫৩ লক্ষ টাকা প্রদান করবে। এই চুক্তি ইংরেজ কোম্পানিকে রাজস্ব শাসনের অধিকার দেয় এবং সূত্রপাত ঘটায় ঔপনিবেশিক শাসনের। নিজামত ক্ষমতা বাংলার নবাবের হাতে এবং দিওয়ানী শাসন কোম্পানির নিকট অর্পণের এ ব্যবস্থা ইতিহাসে 'দ্বৈত শাসন' নামে সুপরিচিত।

দ্বৈত শাসনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

দিওয়ানী হস্তান্তরের ফলে রাজস্ব শাসন পরিচালনার ক্ষমতা কোম্পানি লাভ করে। কিন্তু ক্লাইভ উক্ত দায়িত্ব দেশীয় আমলাতন্ত্রের হাতে ছেড়ে দেন, যদিও সর্বময় ক্ষমতা থাকবে কোম্পানির হাতেই। বাংলার জন্য সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খান এবং বিহারে রাজা সিতাব রায়কে নায়েব দিওয়ান নিযুক্ত করা হয়। সংগৃহীত রাজস্ব থেকে সমস্ত প্রশাসনিক ব্যয় মিটানোর পর তাঁরা উদ্বৃত্ত রাজস্ব কোম্পানিকে প্রদান করবেন। কোম্পানির পক্ষ থেকে তদারক করার জন্য একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট মুর্শিদাবাদ দরবারে অবস্থান করবেন। নবাব নজমুদ্দৌলাকে মসনদে বসাবার সময় কোম্পানি রেজা খানকে নায়েব নাজিম নিযুক্ত করেন। এখন কোম্পানি ঐ একই ব্যক্তিকে বাংলার নায়েব দিওয়ানের দায়িত্ব দেন। এতে এক দ্বৈত শাসনের মধ্যে আরেক দ্বৈততার সৃষ্টি হয়। প্রথমত, নিজামত ও দিওয়ানী দুই পৃথক কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভাগাভাগি হওয়ায় এক দ্বৈত শাসনের সূচনা ঘটে, আবার কোম্পানির রাজস্ব শাসনের দায়িত্ব নায়েব দিওয়ানদের হাতে হস্তান্তরিত হওয়ায় আরেক দ্বৈত শাসনের সৃষ্টি হয়। কোম্পানি রাজস্ব পরিচালনার ক্ষমতা হাতে নিলেও সরাসরি সে দায়িত্ব পালনে রাজি হয়নি। অর্থাৎ কোম্পানি কর্তৃক সরাসরি দিওয়ানীর দায়িত্ব গ্রহণে কিছু অসুবিধাও ছিল। সরাসরি দিওয়ানী শাসন পরিচালনার জন্য যে জনবলের প্রয়োজন তা আদৌ কোম্পানির ছিল না। তাছাড়া এদেশের ভাষা, আইন-কানুন ও রাজস্ব শাসনের রীতি-নীতি সম্পর্কে কোম্পানির কর্মচারীরা ছিলেন অনভিজ্ঞ। তদুপরি সরাসরি রাজস্ব শাসনের ভার হাতে নিলে এদেশে বাণিজ্যরত অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ারও আশঙ্কা ছিল। তাই সচতুর ক্লাইভ দেশীয় এজেন্সীর ওপর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে কোম্পানির নিকট রাখেন শুধু কেন্দ্রীয়ভাবে তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা।

রেজা খানকে রাজস্ব শাসনে পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয় এবং কোম্পানি প্রতিশ্রুতি দেয় যে, রাজস্ব বিষয়ে প্রচলিত ব্যবস্থায় তারা কোন পরিবর্তন আনবে না। ক্লাইভের সময় কোম্পানির কর্মচারীরা রেজা খানের কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে ক্লাইভের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরে দ্বৈত শাসনে সমস্যা দেখা দেয়। এই সময়ে ভূমি রাজস্ব বেশ বৃদ্ধি করা হয় এবং কঠোরভাবে তা আদায়ও করা হয়। তাছাড়া

কোম্পানির কর্মচারী ও গোমস্ড়াদের লুণ্ঠন নীতির ফলে দেশের দুরবস্থা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তারা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির একচেটিয়া ব্যবসা শুরু করে। রেজা খান কোম্পানির কর্মকর্তাদের অবহিত করেন যে, তাদের কর্মচারীরা কম মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় করে অধিক মূল্যে বিক্রি করে, রায়তদেরকে নামমাত্র মূল্যে নানাবিধ দ্রব্যাদি সরবরাহে বাধ্যকরে, দেশীয় ব্যবসায়ীদের ওপর অত্যাচার করে এবং বাণিজ্য শুল্ক দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু কোম্পানি এ সবের কোন প্রতিকার করার দরকার মনে করেনি।

কোম্পানির কর্মচারী গোমস্তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ও অত্যাচারের ফলে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। তার ওপর ছিল ক্রমাগতভাবে রাজস্ব বৃদ্ধির চাপ। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে রেজা খান অভিযোগ করেন যে, নবাব আলিবর্দীর সময়ে পূর্ণিয়া জেলার রাজস্ব ছিল ৪ লক্ষ টাকা, ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৫ লক্ষ টাকায় ওঠে। অনুরূপভাবে দিনাজপুরের রাজস্ব ১২ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। রেজা খানকে কোম্পানির চাপে এই বাড়তি রাজস্ব আদায় করতে হয়। ফলে অনেক পরগণা হতে রায়তরা আমিলদের উৎপীড়ন সহ্য করতে না পেরে অন্যত্র পলায়ন করে বা পেশা পরিবর্তন করে। রেজা খান কোম্পানিকে জানান যে, ইতোপূর্বে বাংলা এত সম্পদশালী ছিল যে, দূর দেশ থেকে ব্যবসায়ীরা এখানে আসতো এবং লক্ষ লক্ষ টাকার পুঁজি খাটাতো। এখন কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা ও তাদের কর্মচারীদের অত্যাচারের ফলে রায়তরা সর্বশান্ত হয়ে পড়েছে। এর প্রতিকার না হলে মহা বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। ক্লাইভের পরবর্তী গভর্নর ভেরেলেস্টও বলেছেন যে, দ্বৈত শাসনে বাংলার রায়তদের ওপর অত্যাচার হয়েছে এবং কৃষি উৎপাদন ও ব্যবসার অবনতি ঘটেছে। কিন্তু কোম্পানির ডাইরেক্টর সভা অর্থনীতির অধোগতি রোধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে এক দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া বাংলায় নেমে আসে যা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত এবং এতে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

দ্বৈত শাসনের ফলে সৃষ্ট অব্যবস্থা, ইংরেজ কর্মচারী ও তাদের গোমস্তাদের লুণ্ঠন, ভূমি রাজস্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং অনাবৃষ্টির কারণে ফসলহানি হওয়ায় এই ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। দুর্ভিক্ষের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দ হতে পরপর দু'বছরের প্রচন্ড ক্ষরায় ফসলহানি হওয়া এবং বাজারে খাদ্য শস্যের মূল্যবৃদ্ধি। টাকায় এক মণ হতে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে টাকায় ৩ সেরে দাঁড়ায়। অধিক মুনাফার জন্য কোম্পানির কর্মচারী ও গোমস্তারা খোলা বাজার থেকে চাল, ডাল কিনে মজুদ করে এবং মানুষের দুর্দশা বাড়িয়ে তোলে। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। অনাহারে চতুর্দিকে মৃত্যু আর মানুষের লাশ পড়ে থাকে। মুর্শিদাবাদ থেকে কোম্পানির আবাসিক প্রতিনিধি রিচার্ড বেচার এক রিপোর্টে বলেন, "এ এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য, এর বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। দেশের কোন কোন অংশে যে মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় মৃত মানুষ ভক্ষণ করছে, তা গুজব নয়, সত্যি। অনাহারজনিত মৃতের সংখ্যা প্রতি ষোল জনের মধ্যে ছয় জন।" নিরন্ন মানুষকে বাঁচানোর জন্য সরকার বিভিন্ন জেলায় লঙ্গরখানা খোলে এবং কিছু অর্থ বরাদ্দ দেয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অতি সামান্য। ইংরেজ কর্মচারী চার্লস গ্রান্ট লিখেন, "আমি স্বচক্ষে দেখলাম, মুর্শিদাবাদে ৭৭ হাজার লোককে অনেক মাস খাওয়ানোর পরেও প্রত্যহ সেখানে প্রায় ৫ শত লোক মৃত্যুবরণ করে। রাস্তাঘাট থেকে মৃতদেহ কুড়িয়ে নেয়ার জন্য একদল লোক নিয়োজিত করতে হয়। মৃতদেহ যারা কুড়ায়, তারাও ক্ষুধার জ্বালায় একে একে মৃত্যুবরণ করে। রাস্তাঘাট ও ঘরের ভেতর পড়ে থাকা মৃতদেহ শিয়াল, কুকুর এবং শকুনী টানাটানি করতে থাকে। পঁচা মৃত দেহের গন্ধ এবং অর্ধমৃতদের কান্না ও কাতরানির জন্য রাস্তায় বের হওয়া দায়। পরিস্থিতি এমন পাশবিক যে শিশু মৃত পিতা-মাতাকে খায়, মা তার মৃত শিশুকে খায়।"

১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে দুর্ভিক্ষ কিছুটা প্রশমিত হলেও মৃতের সংখ্যা কমেনি। কারণ দুর্ভিক্ষের পর দেখা দেয় মহামারী। দুর্ভিক্ষ চলাকালে যারা অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বাঁচার চেষ্টা করে তারাই মহামারীর

কবলে পতিত হয়। অনেকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে পলায়ন করে; কেউ কেউ ভিক্ষাবৃত্তি বা দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করে। এমনিভাবে দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং পলায়নের ফলে বাংলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জমি পতিত ও জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে। এ দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক কোটি লোক মারা যায়– যারা ছিল মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি বাংলার রেশম ও তাঁত শিল্প এ সময় দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের এত দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও তাদের কাছ থেকে অধিক হারে রাজস্ব আদায় করা হয়। এমনকি যারা মৃত্যুবরণ করে বা অন্যত্র পালিয়ে যায় তাদের দেয় রাজস্ব প্রতিবেশীদের নিকট হতে জোর করে আদায়ের চেষ্টা চলে।

এ দুর্ভিক্ষের এক পরোক্ষ ফল দ্বৈত শাসনের অবসান। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দায়িত্বহীন ক্ষমতা ও শোষণনীতি যে মহাদুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার জন্য দায়ী কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তা অনুভব করে। সে কারণে তারা দিওয়ানী শাসন সরাসরি হাতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজস্ব শাসনের দায়িত্বভার নিজ হাতে গ্রহণ করে।

সারসংক্ষেপ

বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পূর্ব ও উত্তর ভারতে অদ্বিতীয় রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ বাংলায় এসে বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে এক চুক্তি করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানী শাসন তথা রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভ করেন। সম্রাটের সাথে ক্লাইভের এ চুক্তি এলাহাবাদের সন্ধি (আগস্ট, ১৭৬৫ খ্রি.) নামে পরিচিত। ক্লাইভ রাজস্ব শাসনের জন্য দেশীয় নায়েব দিওয়ান নিয়োগ করে রাজস্ব শাসনে দ্বৈততা সৃষ্টি করেন। কোম্পানির হাতে ক্ষমতা এবং অন্যের ওপর দায়িত্ব অর্পণের এ ব্যবস্থা দ্বৈত শাসন নামে পরিচিত। কিন্তু এ ব্যবস্থার ফলে রাজস্ব শাসনে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। কোম্পানির কর্মচারীদের দুর্নীতি, স্বার্থপরতা এবং রাজস্ব শাসনে হস্তক্ষেপ নীতির ফলে এটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এতে কৃষি ব্যবস্থা, বাণিজ্য ও দেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে। এর সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ পরিণাম ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ, যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। দ্বৈত শাসনের চরম ব্যর্থতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে এ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব শাসনের দায়িত্ব হাতে নেয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০–১৮৫৭ খ্রি.)।*

২। ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*

৩। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ক্লাইভ কত খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার বাংলার গভর্নর হন?

(ক) ১৭৬২ খ্রি. (খ) ১৭৬৫ খ্রি.

(গ) ১৭৬৭ খ্রি. (ঘ) ১৭৭০ খ্রি.।

২। প্রাদেশিক দিওয়ানের নিয়োগকর্তা কে ছিলেন?

(ক) সুবাদার (খ) কেন্দ্রীয় দিওয়ান

(গ) সম্রাট (ঘ) সিপাহসালার।

৩। মীর জাফরের মৃত্যুর পর কে বাংলার নবাব হন?
(ক) মীর কাশিম (খ) মিরণ
(গ) সিরাজ উদ্দৌলা (ঘ) নজমুদ্দৌলা।

৪। এলাহাবাদের সন্ধিচুক্তি কখন সম্পাদিত হয়?
(ক) ১৭৬৪ খ্রি. (খ) ১৭৬৫ খ্রি.
(গ) ১৭৬৭ খ্রি. (ঘ) ১৭৭০ খ্রি.।

৫। এলাহাবাদের সন্ধি অনুযায়ী দিওয়ানী শাসন লাভের বিনিময়ে কোম্পানি সম্রাটকে বাৎসরিক কত লক্ষ টাকা দেবে?
(ক) ২৬ লক্ষ (খ) ৩৬ লক্ষ
(গ) ৪৬ লক্ষ (ঘ) ৫৩ লক্ষ।

৬। নবাব আলিবর্দীর সময়ে পূর্ণিয়া জেলার রাজস্বের পরিমাণ কত ছিল?
(ক) ২ লক্ষ টাকা (খ) ৩ লক্ষ টাকা
(গ) ৪ লক্ষ টাকা (ঘ) ৭ লক্ষ টাকা।

৭। দ্বৈত শাসনের অবসান কখন হয়?
(ক) ১৭৭০ খ্রি. (খ) ১৭৭২ খ্রি.
(গ) ১৭৭৪ খ্রি. (ঘ) ১৭৭৫ খ্রি.।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। দিওয়ানী কি তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
২। দ্বৈত শাসনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।
৩। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। বাংলায় ইংরেজদের দিওয়ানী লাভের পটভূমি আলোচনা করুন।
২। দ্বৈত শাসন বলতে কি বুঝায়? এর ফলাফল আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

পাঠ-১ ঃ ১। (ক); ২। (গ); ৩। (ক); ৪। (ঘ)।
পাঠ-২ ঃ ১। (গ); ২। (খ); ৩। (খ); ৪। (ক); ৫। (গ); ৬। (ঘ); ৭। (গ)।
পাঠ-৩ ঃ ১। (খ); ২। (ক); ৩। (গ)।
পাঠ-৪ ঃ ১। (গ); ২। (খ); ৩। (ঘ); ৪। (খ); ৫। (গ); ৬। (ক)।
পাঠ-৫ ঃ ১। (খ); ২। (গ); ৩। (ঘ); ৪। (খ); ৫। (ক); ৬। (গ); ৭। (খ)।